বিজ্ঞান ও ইসলাম : অন্তিম সংঘাত

মূল : টড পিকক
অনুবাদ : তানবীরা তালুকদার

১

এই পুরো পৃথিবী জুড়েই মানুষের মধ্যে ভাষা এবং সংস্কৃতির অনেক বিভিন্নতা রয়েছে, এই ভিন্নতার মধ্যেই বিজ্ঞান তার নিজস্ব ভাষা ও গতি দিয়ে গোটা বিশ্বজুড়ে কম বেশী তার শক্ত শিকড় গড়ে নিয়েছে। শুধুমাত্র বেশ কয়েকটি ইসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া, যেখানে কোরানের আইন আজোও রাজত্ব করছে। আজ আমি ধর্ম আর বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের সেরকম একটি গল্পই বলবো।

কায়রো, মিশর : 'ইসলাম আর বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই' - উচ্চস্বরে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন **জাগলুল এল নাগার**। কায়রো শহরের উপকণ্ঠে একটি সমৃদ্ধশালী জায়গায় জাগলুল এল নাগরের সাথে তার নিজস্ব আবাসস্থল ভিলা ইন মাদির, কফিরুমে বসে কথা হচ্ছিল- 'বিজ্ঞান হলো অনুসন্ধান। অজানা কে জানা। আর ইসলাম জ্ঞান অন্বেষনকে প্রেরণা দেয়। জ্ঞান অন্বেষনকে প্রার্থনা করার সমান মনে করা হয়।'

কায়রো শহরের উপকণ্ঠ

তিনি ব্যাখ্যা করে অমাকে বুঝাতে চাইছিলেন, যেটাকে লোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে, আসলে প্রকৃতপক্ষে সেটা 'ইসলামিক পদ্ধতি'। এই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানই মুসলিম সভ্যতা থেকে আসা। নবী মুহম্মদ (সাঃ) ও বলে গেছেন দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ করো। কোরাণের সর্বপ্রথম বানীটি হল - ইকরা অর্থাৎ- 'পড়ো'। তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তা সর্ম্পকে জানতে হবে, ধ্যান করো, বিশ্লেষন করো, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করো।

ডঃ এল নাগার - মিশরের মূল ধারার পত্রিকার প্রবন্ধকার; খুব পরিচিত একজন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব। পেশায় একজন ভূতত্ত্ববিদ যাকে অনেক মিশরীয় এবং তার সহকর্মী বিজ্ঞানীরাও সমাজের **নেতৃস্থানীয়** হিসেবে বেশ সম্মান করেন। একজন বিশেষজ্ঞ যিনি পৃথিবীর জৈব ভূ-স্তর বিন্যাস - কিভাবে জীবন্ত প্রাণীসত্ত্বার দ্বারা পৃথিবীর ভূ-স্তর তৈরী হয়েছে এধরনের চমকপ্রদক বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, এল নাগার লন্ডনের ভূতত্ত্ব বিভাগের একজন সদস্য, তার লেখা প্রবন্ধ সেখানে প্রকাশ ও বিশ্বব্যাপী সেটাকে প্রচার ও পরিবেশন করা হয়। কিন্তু তিনি একজন গোড়া ইসলামী মৌলবাদী, এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি এই পৃথিবীকে কোরানের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখা করে থাকেন।

জাগলুল এল নাগার

গোটা আরব বিশ্বে ধর্ম একটি প্রচন্ড শক্তিশালী মাধ্যম, আরব বিশ্ব ছাড়া বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও ধর্মের এতো ব্যাপকতা নেই। যেকোন ধরনের অঘটনের পরেই মিশরের ধনী, গরীব সবাই সেটাকে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে বলে সাধারণত ব্যাখা করে থাকেন। ১৯৬০ সালে সরকার সমাজতন্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে দেশে যে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনেন, গামাল আবদুল নাসেরের দ্বারা আরব সমাজের জাতীয়তাবাদের পতন, ১৯৬৭ সালে ইস্রাইলের সাথে যুদ্ধে হেরে যাওয়া, দারিদ্র্য, সরকারের অযোগ্যতা, এ ধরনের সমস্ত কিছুই তারা এভাবে ধর্মীয় ভাবালুতার মাধয়মে ব্যাখা করে থাকেন।

আমি সরাসরি কায়রোর ইতিহাসের বর্ণাঢ্য গতিশীলতা থেকে শুরু করে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য দুটোই প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ মিলিয়ন লোকের একটি শহর কায়রো যেখানে পুরো মিশরের লোক সংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ বসবাস করে। আবাসিক এলাকা, পুরনো দিনের প্রায় ভেঙ্গে পড়া সুন্দর স্থাপত্য, এবং প্রায় ভেঙ্গে পড়া এসব বাড়ি ও ধ্বংস স্তুপের ছাদের মধ্যে বসবাস করা লোকজন কারণ এসব ভগ্নাংশ

সরিয়ে নেয়ার মতো লোকবলও তাদের সরকারের নেই। শহরের মধ্যে উন্মুক্ত নাচ - গান, জুয়ার আসর সহ বিলাস বহুল হোটেল, মিনার এমনকি পিজা হাট ও আছে। কায়রো শহরের এ্যামেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় তাহরির স্কোয়ার থেকে সামান্য একটু দূরেই অবস্থিত, যাতায়তের জন্য সেখানে একটি বড় চত্বর আছে, পথচারীরা সেখানে ভয়ানক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মেরামতরত পুরনো ভাঙ্গা গাড়ি পার হয়ে আসা যাওয়া করেন। দিনের পুরোটা সময়ই পুরুষেরা শহরের চায়ের দোকানে বসে হুক্কা সেবন করে, এই পরিবেশে যদি কোন নারীকে দেখা যায়, তিনি অবশ্যই একজন বিদেশিনী। বেশীর ভাগ মিশরীয় রমনীরা নেকাব পরিধান করে থাকেন, দিনের নির্ধারিত সময়ে যখন মুয়াজ্জিন আজান দেন, মুসলমানদেরকে প্রার্থনার জন্য ডাকেন, পুরুষেরা এসে শহরের মসজিদকে ভরিয়ে তুলেন।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে ইসলাম সমাজেরও যথেষ্ঠ অবদান আছে। বিরাট একটি সময় ধরে কায়রো আরবীতে ‘আল কাহিরা’ যে শব্দের মানে বাংলাতে ‘বিজেতা’ ইসলাম সমাজকে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে বহু দিক থেকেই ইসলাম গোড়া খ্রীষ্টানদের থেকে অনেক বেশী সহিষ্ণু। যেমন, বাইবেল ওয়ালারা যে পৃথিবীর বয়স মাত্র ছয় হাজার বছর বলে নাচানাচি করে, এ ধরনের জিনিস কিন্তু ইসলামে নেই। কিংবা ক্লোনের গবেষণা নিয়েও কোন ঝামেলা নেই এবং এটি বেশ সমাদৃত; যদিও বর্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা মিশরে খুবই কমে গেছে। আর এই অনগ্রসরতার জন্য কে দায়ী?

কিন্তু এল নাগার তাদের এ অনগ্রসরতার জন্য ইসলামকে দায়ী করেন না। তাঁর মতে ‘এর জন্য ইসলাম নয় বরং আমেরিকা আর বৃটেনই সমস্ত নষ্টের হোতা।’

পাশ্চাত্যের লোকদের এভাবে আক্রমণ করে কথা বলা এল নাগার এর একটি সাধারণ বিষয়। ‘দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে তারা প্রায়ই স্যুট - টাই পড়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়’ - বলছিলেন এল নাগার (যদিও সে সময়ে তিনি নিজেও ফিকে সবুজ রঙ্গের কেতাদুরস্ত স্যুট পড়া ছিলেন)। তিনি তাঁর পাশ্চাত্যের সহকর্মীদের জন্য করুণা অনুভব করেন, যারা নিজ নিজ পেশায় একেজন বিশেজ্ঞ হয়ে উঠছেন, কিন্তু নিজেদের আত্মাকে অনবরত অস্বীকার করে চলেছেন। তিনি কঠোর ভাষায় সমকামীতাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য পশ্চিমা বিশ্বকে সমালোচনা করেন। পরিতাপের সুরে তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব মানুষকে পশুর চেয়েও নীচের স্তরে নামিয়ে আনছে, ‘একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি দেখছি যত বিপদ আপদ সব পশ্চিম দিক থেকেই অসছে, পুর্ব দিক থেকে নয়’।

কোরান ও বিজ্ঞানের উপর লেখা তার তিনটি ছোট ছোট বই আমাকে উপহার দিলেন। এর মধ্যে একটি বই হলো *কোরানের দৃষ্টিতে পাহাড়ের ভৌগলিক গঠন*, *সুন্নাহ একটি মহামূল্যবান সম্পদ - বৈজ্ঞানিক*

দৃষ্টিতে, আর *কোরানের একটি অনুবাদ কপি*, যেখানে প্রথম পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর ছিল যদিও অনুবাদক হিসেবে কোথাও তার নাম ছিল না।

সুন্নাহ একটি মহামূল্যবান সম্পদ বইটিতে এল নাগার নিজের মতো করে কোরানের পবিত্র বানী, হাদিস - মুহম্মদের বানী, সুন্নাহ ও প্রচলিত রীতি নীতিকে ব্যাখা করেছেন। এল নাগারের মতে কোরানে এক হাজারেরও বেশী বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর ইঙ্গিত দেয়া আছে, এবং সেই ঈশারা আছে মুহম্মদের অনেক বাণীতেও; যদিও সরাসরি কোথাও কোন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখা বা প্রমাণ নেই। তার পরিবর্তে আছে কতগুল ইঙ্গিত আর ঈশারা। এল নাগারের মতে, এই ইঙ্গিতগুলোর মাধ্যমে মানুষকে চিন্তা করার আর কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে। কোরাণ আর বিজ্ঞানের সর্ম্পকের উদাহরণ টানার একটি খুব সাধারণ কৌশল হলো, কিভাবে কোরাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আভাস দেয়া ছিল, কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি বা কৌশল জানা ছাড়াই আধনিক বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন ব্যাপারগুলো কত আগেই কোরাণের বাণীতে অনুধাবন করা হয়েছিল - এ ধরনের 'যুক্তি' দেয়া। এল নাগার তার এই বইটিতে পবিত্র গ্রন্থের বাণী উল্লেখ করেছেন, 'সূর্য এবং চন্দ্র প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কক্ষপথে ভ্রমণ করছে'। আল্লাহর প্রেরিত বাহক সৌরজগত ও পৃথিবী নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক ও পরিমিত এমন সমস্ত কথা বলে গেছেন, তাও সেই সময়ে যখন পৃথিবীকে লোকে চ্যাপ্টা ও অনড় ভাবতো। মুহম্মদ যে সত্যদর্শী ছিলেন এটা অবশ্যই তার একটা প্রমাণ।

২

সব জায়গায় তিনি নবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নবী বলেছিলেন সাতটি পৃথিবীর কথা। ভূতত্ববিদদের কথা উল্লেখ করে এল নাগার দাবী করেন পৃথিবী সাতটি স্তরে বিভক্ত। অন্য এক জায়গায় নবী বলেছিলেন মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়া আছে, ইসলামিক গবেষকরা বলে থাকেন চিকিৎসা বিজ্ঞান এই সংখ্যাকে সমর্থন করে। এ ধরনের সূক্ষ জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি তাদের মতে শুধু আল্লাহ তালাই দিতে পারেন।

সমালোচকরা অবশ্য বলে থাকেন, ইসলামিক গবেষকরা প্রায়ই একে অন্যের ভুল-ভাল কথাকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন, চতুর্দিকে একটি বিভ্রম তৈরী করেন যেনো এ তথ্যগুলো বিশাল কোন গবেষণা থেকে পাওয়া। মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়ার কথা চিকিৎসা বিজ্ঞান মোটেই সমর্থন করে না, এ সংখ্যা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন থাকে, আর যেটার সাধারণ গড় হলো তিনশ সাতটি। আধুনিক ভূততবিদরা পৃথিবীর আবরনকে সাতটি নয়, বরং পনরটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন যার অপর নাম হলো প্লেট টেকটনিক ।

এল নাগার এমনকি ২০০৫ সালে সংগঠিত ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সুনামীতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুতেও আল্লাহার মহানুভবতা দেখতে পান। প্লেট টেকটনিক আর বিশ্বব্যাপী বাড়তি উষ্ণতা এর জন্য দায়ী। পশ্চিমা বিশ্বের পাপের অপরাধে আল্লাহ নাকি তাঁর তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। কেনো তাহলে আল্লাহ লস এঞ্জেলস কিংবা ফ্লোরিডার তীর ছেড়ে দক্ষিন পূর্ব এশিয়াকে শাস্তি দিতে গেলেন? এল নাগার জবাব দিলেন, আঘাত প্রাপ্ত স্থানটি পশ্চিমা পর্যটকদের অনেক অনৈতিক কুকীর্তির মাশুল দিয়েছে।

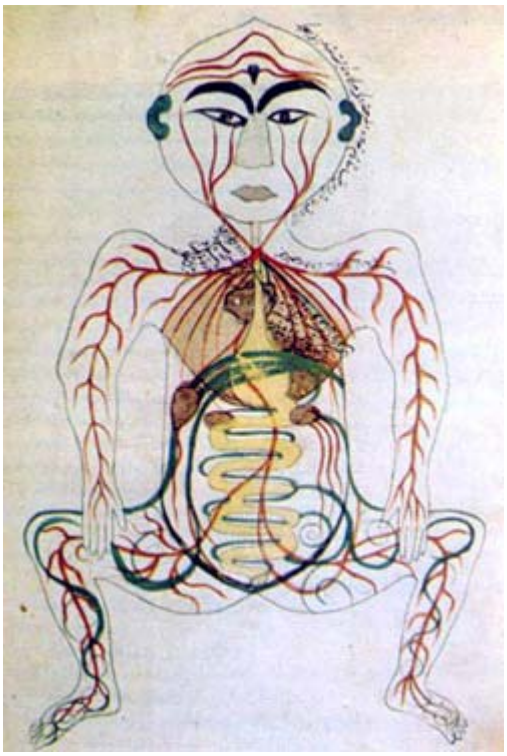

এগার'শ শতাব্দীর একটি প্রতিকৃতি

(মাজলিশ লাইব্রেরী, তেহরান এ সতেরশ শতাব্দী এ ডি, মানসুর বিন মুহম্মদ আহমাদ-এর আকা একটি পার্শিয়ান চিত্রাঙ্ক)

জনাব এল নাগার এর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এতোটাই যে - আরবের স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে হরদম তাঁর উপস্থিতি দেখা যায়, যার দ্বারা তিনি অতি সহজে লাখ লাখ দর্শক শ্রোতার কাছে চলে যান। জ্ঞান - বিজ্ঞানের ধারক কায়রোর আল আহরামে অবস্থিত রাজনীতি ও কৌশলবিদ্যা অধ্যয়নের স্থান এর রাজনৈতিক গবেষক **গোলাম সোলতানের** সাথে যদিও তার সম্পর্ক ততোটা উষ্ণ নয়।

সোলতান আমাকে বলছিলেন, জীবন যাপনের ব্যাপারে ধর্মীয় ব্যাখাগুলোকে বিজ্ঞান দিয়ে সারাক্ষণ ‘প্রমাণ’ করার এই যে প্রবণতা তাদের মধ্যে, সেটা প্রকৃত পক্ষেই অসৎ। নর্দান ইউনির্ভাসিটি থেকে ডক্টরেট করা সোলতান, তীব্র তামাকের গন্ধে ভরা তার ছোট্ট অফিসে বসে কাজ করেন, তার অফিসের ডেস্ক আর মেঝেতে পত্রিকা আর সাময়িকী গাদা করে রাখা। তিনি বলেন, ‘এদের পদ্ধতি ঠিক নয়’। সোলতান বলেন, ইসলামিক বিজ্ঞানীরা কাজ শুরুই করেন উপসংহার মাথায় রেখে (কোরাণ বলে মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়া আছে) আর তারপর এটিকে সত্যি প্রমাণ করার জন্য সর্বোপরি চেষ্টা চালান। এ ক্ষেত্রে তাদের পছন্দমতো উত্তরে পৌছবার জন্য তারা মানুষের শরীরের সে সমস্ত জোড়া গুলোকেও জোড়া হিসেবে দেখাবেন, যেগুলোকে একজন মেডিকেল-ডাক্তার মোটেই জোড়া হিসবে গন্য করেন না। তাদের দেখলে মনে হয় তাঁরা ভুত-ভবিষ্যতের সবকিছুই জেনে বসে আছেন, কিভাবে পৃথিবী তৈরী হলো, কে পৃথিবী তৈরী করলেন -সব কিছু, আর তাদের এসব ব্যাখা করার বদলে শুধু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন। সোলতান আরো বললেন, যেকোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চালিকা শক্তি হওয়া উচিৎ শুধু সত্যের অনুসন্ধান করা, এবং বলা বাহুল্য সত্যে পৌছুনোর দরজা কিন্তু এখনো খোলা রয়েছে।

যে সকল গবেষকরা ইসলামপন্থীদের মতামতের বা ‘গবেষণা’র সাথে একমত পোষণ করতে পারেন না তারা সাধারণতঃ বিষয়গুলো এড়িয়ে যান। কারণ এ সমন্ধে উচ্চবাচ্য করলে তাদেরকে হয়তো কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়তে হবে। সুতরাং বির্তক এড়িয়ে যাওয়াটাই অনেকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, আপনি য়দি বিজ্ঞানী হন এবং চরমপন্থী ইসলামিক ভাবনা সম্পন্ন না হন, তবে শুধুমাত্র নিজের কাজে মনোনিবেশ করাই ভালো। যে সকল বিজ্ঞানী কোরানিক-বিজ্ঞানকে সমর্থন করেন না, তারা ইচ্ছে করেই নিজেদেরকে ‘লো-প্রোফাইলে’ রাখেন। এ প্রসঙ্গে আমি সোলতানের কাছে কিছু উদাহরণ চাইলাম কিন্তু তিনি এড়িয়ে গেলেন, কিছুতেই ব্যাখা করতে চাইলেন না।

কোন বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি র ব্যাপারটা এখানে কোনদিনই প্রাধান্য পায় নি। ১৭৯৮ থেকে ১৮০১ সাল পর্যন্ত মিশরে যখন নেপোলিয়ন বোনাপার্তের দখলদারীত্ব চলছিল, তখন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম মিশরে পদার্পন করেন। ইউরোপীয়ান বিজ্ঞানীদের আগমনে মিশরীয়দের প্রথম টনক নড়ে যে কতোটা তারা বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছেন। এই কষ্টের অনুভূতি তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রেরণা এনে দেয় যা অনেকদিন টিকে ছিল। দীর্ঘ দেড়শটি বছর এ জাগরণ বিদ্যমান ছিল, কায়রোর উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তখন বিশ্বব্যাপী কায়রো শহরকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হতো। মেধাবী ছাত্রদের আসা এবং যাওয়া দুটোই সমানতালে চলত। যেভাবে মিশরীয় গবেষকরা গবেষণার কাজে পশ্চিমা বিশ্বে আসতেন ঠিক সেভাবেই এ্যামেরিকা, ইউরোপ থেকেও গবেষকদের মিশরে আসা যাওয়া লেগে থাকতো।

এরপর ১৯৫২ সালে রাজা (প্রথম) ফারুকের বিরুদ্ধে গামাল আবদেল নাসেরের নেতৃত্বে অভূথথান ঘটে। নাসের ছিলেন আরব বিশ্বের প্রথম আধুনিক নেতা যিনি পুরো আরব সমাজের মুখপাত্র ছিলেন। তার কাছে

জাতীয়তাবাদের মানে ছিল সমস্ত আরব সমাজকে একত্রিত করা - শুধু মিশরীয়দের নয়। তাঁর এই নীতিই এ্যামেরিকা আর ইউরোপের প্রতি সমগ্র আরব বিশ্বের বিরূপতাকে উস্কে দেয়। সোলতান বললেন, নাসেরের সময় থেকেই আরব বিশ্বের জাতীয়তাবোধ উজ্জীবিত হয় এবং পশ্চিমাদের সন্দেহের চোখে দেখাও শুরু হয়ে যায়।

সোলতানের চোখে সবকিছুর ঢালাও ইসলামীকরণ এবং সরকারী নীতি - এই দ্বৈতপ্রকল্পই বিজ্ঞান চর্চার দিকে জনগণকে অমনোযোগী এবং নিরুৎসাহিত করে তুলেছে। তিনি বলেন, আমরা একটা ক্রান্তিকালীন সময়ের মাঝে এখন আছি, এবং আমার মনে হয় হয়তো আমাদের এই দুঃসময়ের মাঝে অনেক দিন কাটাতে হবে।

এখনও মিশরের সাধারণ লোকজন আর শাসকরা সমাজে ধর্মকে শক্ত করে আকড়ে ধরে রেখেছে। গ্যালিলিও আর কোর্পানিকাসের সময়ে ইউরোপে যেমন বিজ্ঞানকে, ধর্ম যাজকরা তদের বিরাজমান শক্তির প্রতি হুমকি মনে করতো, এখন মিশরেও অনেকটা সেরকমই অবস্থা। এখন মুক্ত চিন্তার দরজা সেখানে প্রায় বন্ধ বললেই চলে। কারণ হিসেবে সোলতান উল্লেখ করলেন, ১৯৫০ সাল থেকেই কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পশ্চিমা শিক্ষক আসছেন না আর দেশের ভিতরের নৈরাজ্যজনক শাসন পরিস্থিতির সাথে যারা একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেনি তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যাল্যয় ছেড়ে চলে গেছেন দূরে।

আমি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রবেশ করলাম জনাব **ওয়াহিদ বাদায়ই** এর সাথে পুর্বনির্ধারিত সাক্ষাতের জন্য, ওয়াহিদ বাদায়ই রসায়ন বিভাগের একজন অধ্যাপক যিনি ১৯৬৭ সাল থেকে সেখানে শিক্ষকতা করছেন। আমরা যখন তার কক্ষে বসে কথা বলছিলাম, আমাদের আলাপচারিতার মাঝেই, তার ছাত্র এবং ছাত্রীরা আসা যাওয়া করছিল। ছাত্রীদের সবারই মাথা ঢাকা ছিল, তরুন সমাজের মধ্যেও রয়েছে ধর্মের কঠিন নিয়ম-কানুন মেনে চলার প্রবণতা। তিনি নিজে একটি ল্যাবটেরীর সাদা কোট পড়া ছিলেন আর তার ল্যাবটরীর চর্তুদিকের দেয়ালে ও কর্কবোর্ডের মাঝে কোরানের বিভিন্ন বানী টানানো ছিল। ১৯৮০ সালের দিকে যখন জার্মানীর সিমেনস কোম্পানীতে কাজ করতেন জনার বাদায়ই, তখনই তিনি সৌর শক্তির রুপান্তর এর উপর ডি -লিট অর্জন করেন, কিন্তু তিনি নিজেকে জনাব এল নাগার এর মতো ইসলামিক বৈজ্ঞানিক বলতে রাজী নন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ বৈজ্ঞানিক যিনি মনে করেন বিজ্ঞান আর ধর্ম দুটি আলাদা ব্যাপার, তাদের অবস্থান দুটি ভিন্ন বলয়ে।

কিন্তু ডারউইনিজম বা জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ নিয়ে তাহলে কি বলবেন? আমি প্রশ্ন করলাম তাকে (মিশরের স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় যদিও সৌদি আরব এবং সুদানের স্কুলে বিবর্তনবাদ নিষিদ্ধ)। জবাবে বাদায়ই বললেন যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আদমের সৃষ্টি কি বানর থেকে হয়েছিল,

তাহলে আমি বলব না। মানুষ বানর থেকে আসেনি। যদি আমি ধর্মপ্রাণ হই, আমি যদি ইসলামকে বিশ্বাস করি তাহলে আমাকে ইসলামের সবগুলো তত্বই মানতে হবে। আর এই তত্বগুলোর একটি হলো মানুষের আবির্ভাব হয়েছে আদম আর ইভ থেকে। আমি একজন বৈজ্ঞানিক, আমাকে এটা বিশ্বাস করতেই হবে।

কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কি এটি শুধুমাত্র একটা গল্প নয়? আমি তাকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমি যদি একটি প্রবন্ধ লিখি আদম আর ইভের গল্প শুধুমাত্রই একটি গল্প, সত্যি কিছু নয় তাহলে সেটা কেউ গ্রহন করবে না যতক্ষন না আমি সেটা প্রমান করতে পারব।

‘কোন ব্যক্তিই প্রমান ছাড়া যা ইচ্ছে লিখতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কাছে সত্যি প্রমান আছে যে আদমই এই সৃষ্টির সর্বপ্রথম মানব ছিলেন সে গল্পটি সঠিক।’

কি প্রমান?

তিনি বিস্ফোরিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কোরানে লেখা আছে।

৩

তিউনিস, তিউনিসিয়া ঃ কায়রোর ভারী কুয়াশাচ্ছন্ন বাক্যালাপের পর, তিউনিস সমুদ্রের নোনা বাতাস আর খোলা প্রান্তর ছিল এক রকমের মুক্তি। ভূমধ্যসাগরের তীরে নোঙ্গর করে আছে যেনো তিউনিসিয়ার রাজধানী, পাহাড়ের উদার প্রান্ত আর শহরতলী ঢাকা রয়েছে তাল গাছের ছায়াতে, বাগানগুলোতে মন কাড়া বোগেনভিলার ঝাড়। যে শহরটাতে আমি উঠলাম সেটাকে বলে সিদি বো। এখানের চারপাশে ভীষনভাবে ইটালী বা দক্ষিন ফ্রান্সের মতো প্রাচীন যুগের ছোয়া ঘিরে আছে। প্রকৃতপক্ষে সিসিলীর থেকে মাত্র ৮০ কি,মি, দূরে তিউনিস ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও এর নিকটবর্তী। অনেকেই বলেন, ইউরোপের পাশে ভূমধ্যসাগর আরব থেকে বেশ দূরে আর সেখানকার লোকেরা প্রকৃত এরাবীয়ান নন। আমি এয়ারপোর্টে আসার সময় আমার মিশরীয় দোভাষী বলেছিলেন, তারা আসলে ফ্রেঞ্চ। তিনি খুব একটা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এটি বলেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সরকারী কর্মকর্তা বললেন আমরা ধর্মীয় উগ্রতাকে আর এই উগ্র মানসিকতাকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কাজের জায়গা থেকে সাফল্যের সাথে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছি। ইসলামী চরমপন্থী ঘেরা সাগরের পাশের একটি ছোট্ট দ্বীপে এক কোটি জনগণের দেশ তিউনিসিয়া। চরমপন্থীরা ধর্মের সাথে সমস্ত কিছুর সংঘাত কমিয়ে আনতে চায়, এমনকি বিজ্ঞানেরও। কিন্তু ইসলাম আর বিজ্ঞানের মাঝে সংঘাত অনিবার্য।

তিউনিসিয়া ফ্রান্সের অধীনে ছিল যারা ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা পায়, আরব প্রতিবেশীদের মতো তাদেরও মানবাধিকার লংঘনের কথা শোনা যায়, এদেশের প্রেসিডেন্ট আর তার পরিবার দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। ফ্রীডম হাউজ নামের একটি অলাভজনক সংস্থা বাক স্বাধীনতার দিক থেকে এই দেশটিকে ১৯৫ এর মধ্যে ১৭৯ এর সূচক দিয়েছে। মার্চ মাসে একজন ভিন্নমতালম্বীকে সাড়ে তিন বছরের জন্য জেল এর শাস্তি দেয়া হয় (যিনি এরমধ্যে দুবছর বিচারের অপেক্ষায় জেলে কাটিয়ে দিয়েছেন), তার অপরাধ তিনি স্বাধীনতার জন্য উচ্চস্বরে লড়াই করেছিলেন। যদিও মিশরীয়দের থেকে তারা বেশ আলাদা, মিশরীয়রা সারাক্ষন অনবরত তাদের বাক স্বাধীনতার জন্য খোলামেলাভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তিউনিসদের অনেক কিছুতেই আমি বেশ ইতিবাচক প্রবনতা দেখেছি। বর্তমান সরকারের প্রতি তাদের প্রগাঢ় বিশ্বস্ততার একটি বড় কারণ হলো তারা বিশ্বাস করেন তাদের প্রেসিডেন্টের যে প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি একজন ইসলামী চরমপন্থী হতে পারেন। এই সরকারকে সর্মথন করার আরো একটি বড় কারণ আছে অনেকের মধ্যে, অন্যান্য আরব দেশের তুলনায় শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সাধারণ মানুষের যে মৌলিক অধিকারগুলো আছে, সেগুলো সবার কাছে খুব ভালোভাবে পৌছে গেছে।

যদিও রীতিমাফিক তিউনিসিয়া একটি মুসলিম দেশ, কিন্তু তারা সক্রিয় ভাবে অন্যান্য আরব দেশের থেকে মসজিদ ও তার বাইরের সমাজের দূরত্ব বজায় রাখে। ব্যক্তি মালিকানাধীন কাজে দাড়ি, নেকাব নিষিদ্ধ। রাস্তায় চুল ঢাকা অনেক তরুনী দেখা যায় কিন্তু এটাও আবার অস্বাভাবিক না যে সে মেয়েকেই আবার দেখা যাবে জীনস পড়ে, শুধুমাত্র ধর্মের কারণে ব্যবহার করা নেকাবকে যতদূর সম্ভব আধুনিক ঢঙ্গে পড়ে হেটে যাচ্ছে। স্কুলের পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন ধর্ম এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সর্ম্পকে আলোচনাও বেশ কম। মিশরের মতো সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামিক বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। ইসলামোলজি আর ইসলামি চরমপন্থীদেরকে সেখানে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

মিশরের থেকে সর্ম্পূন বিপরীত অবস্থা, যেখানে আমি সবচেয়ে বেশী আধুনিক ও পশ্চিমা মনোভাব সম্পন্ন বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলেছি যারা কথোপকথনের এক পর্যায়ে নিজেদেরকে ভালো মুসলমান হিসেবে দাবী করেন। তিউনিসিয়ার যেসব বৈজ্ঞানিকদের সাথে আমি কথা বলেছি তাদের ধর্ম সর্ম্পকে ব্যক্তিগত মতামত আমার কাছে খুব বেশী প্রাসঙ্গিকও নয়। আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল কিভাবে বিজ্ঞানকে, রাজনীতির মতো আশে পাশের সাধারণ সমস্যার সাথে জড়িয়ে দেয়ার একটা প্রবনতা আছে। তিউনিসিয়ার দ্বিতীয় বৃহতম শহর সাফাক্স এর বায়োটেকনোলজি সেন্টার এর বায়োপ্রসেস ল্যাব এর হেড **সামি সায়াদী** এক দশকেরও বেশী সময় ধরে গবেষনা চালাচ্ছেন কিভাবে জলপাই এর বজ্য অংশকে আবার নতুন করে তেল বানানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। জলপাই সবসময়ই আরবের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী দ্রব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তখন থেকেই যখন আরবে স্বর্নযুগ বিরাজ করতো, আর এখনও এটি সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে সমস্ত আরবে স্বীকৃত, আর সায়াদীর অর্জনতো জলপাইকে সোনায় রুপান্তর করার মতোই ঘটনা।

সায়াদী'র ভাবনা অনেকটা সেরকমই যেরকমের দর্শন তিউনিসিয়ার ক্ষমতাশীনরা চান, আর সম্প্রতি এটা সব জায়গায় উপলব্ধিও করা হচ্ছে যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রত্যেক জাতির অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ২০০৫ সালে বিভিন্ন গবেষনার বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৩৯টি গবেষনাগার আছে সারা দেশ জুড়ে, যেখানে ১৯৯৯ সালে ছিল মাত্র ৫৫টা। সরকার সক্রিয়ভাবে এই অগ্রগতিকে সহযোগিতা দিচ্ছে।

সামি সায়াদী: তিউনিসিয়ার সাফাক্স ল্যাবে বিকল্প শক্তি নিয়ে গবেষণা করেন

তিউনিস শহরের দক্ষিন পাশে মাত্র নব্বুই মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত বওরজ - কেডরিয়া সায়ন্স এন্ড টেকনোলজী পার্ক, একটি চত্বর যেখানে শিক্ষার সুবিধা, শিল্পের সুবিধা, উদ্ভাবন ও উন্নয়নের সুবিধা ছাড়াও ব্যবসায়ীদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসার একটি অভূতপূর্ব মিলনকেন্দ্র। এই পার্কটির কাজ শেষ হতে আরো বহু বছর লাগবে, যদিও সেখানে এখন কিছু ভবন আছে যেখানে পদার্থ, ভূতত্ব এধরনের বিষয়ের কিছু গবেষনা বিভাগ চালু হয়েছে, আর তারা এধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে সেখানে গবেষনা চালাচ্ছে যেগুলো পশ্চিমা দেশে হাই স্কুলেও ব্যবহারের উপযোগী নয়। তারা বিজ্ঞানের প্রতি অসীম ভালোবাসা আর আগ্রহের কারণে বিভিন্ন প্রজেক্ট চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিস্থিতি হয়ত শীগগীরই পরিবর্তন হবে। বুভুক্ষের মতো এরা লাভজনক আবিস্কারের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেসব উৎপাদনমুখী শিল্প গবেষনাগারের বাস্তব উপযোগীতা আছে, তিউনিসিয়ার সরকার তাদেরকে চার বছরের চুক্তিপত্র দিচ্ছেন। বওরজ - কেডরিয়া গবেষনাগারের প্রবীন গবেষকরা মাসে ১১০০ মার্কিন ডলার বেতন পান (এখানে যারা বসবাস করেন তাদের জীবন ধারণের জন্য মাঝারি ধরনের বেতন), কিন্তু নতুন কর্মসূচীর আওতায় যে একটি মূল ভালো আবিস্কার দিবেন তিনি রয়ালিটির অর্ধেক পাবেন।

৪

এরপরও, তিউনিসায়ার বিজ্ঞানের প্রতি সর্মথনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য থাকে শুধুমাত্র জ্ঞান অন্বেষণ, সেসব প্রকল্পকে কোন ধরনের সহায়তা দেয়া হয় না। বৈজ্ঞানিক গবেষনা, প্রযুক্তি ও সার্মথ্য উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী তাইব হাদরী, যিনি ২০০৪ সাল থেকে এই মন্ত্রনালয়টি তৈরী হওয়া অব্দি ক্যাবিনেটের পদে আছেন বলছিলেন, প্রত্যেকে শুধু মৌলিক গবেষণা করতে চায়। আমি একজন

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গণিতবিদ এবং আমিও মৌলিক গবেষনা করতে চাই। কিন্তু সেটা হবে আমাদের পরের ধাপ। কিন্তু এখন আমাদের ব্যবসার জন্য প্রযুক্তির দরকার বেশী।

চিকিৎসক ও প্রজননবিদ (geneticist) হাবিবা বোওহামেদ চাবৌনি একাধারে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখার একজন গবেষক, শিক্ষিকা ও রাজধানীর কেন্দ্রে অবস্থিত চার্লস নিকোলস হাসপাতালের একজন কর্মরত চিকিৎসক। তাঁর সাথে কথা বলে আমার মনে হলো বিজ্ঞানের যাত্রা এখানেও সনাতনপন্থীদের টানা হ্যাচরা থেকে সর্ম্পূন মুক্ত নয়। তিনি ২০০৬ সালে বিজ্ঞানে নারীদের অবদানের জন্য দেয়া পুরস্কার ' **L'Oréal-UNESCO'** এর বিজয়িনী। তিনি বংশানুক্রমিক ব্যাধি নিবৃত্ত করার গবেষনার জন্য এ পুরস্কার লাভ করেন। পাচজন নারীকে ১০০,০০০ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। এই পাচজনের প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব মহাদেশকে উপস্থাপন করছিলেন। যখন তিনি তার কর্মস্থলে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানান, তখন তিনি ল্যাবটরীর একটি সাদা গাউন পরা ছিলেন। যে টেস্ট টিউবগুলো রোগীদের আটকে পড়া ডি,এন,এ গুলোকে আলাদা করতে জোর গতিতে ঘুরে যাচ্ছিলো, যেগুলো তিনি পরে পরীক্ষা করবেন।

চাবৌনি ১৯৭০ দশকের মধ্যভাগে তার কর্মজীবনের প্রথমদিকের কথা বলছিলেন, যখন অনেক বাচ্চাকেই তিনি বিকলাঙ্গতার শিকার হতে দেখেছিলেন। তিনি বলছিলেন, এটা খুবই দুঃখজনক, আমি দু, তিন, চার ভাইবোন এরোগে আক্রান্ত এমন পরিবারও দেখেছি। আমি এই সমস্যার প্রতিকার করতে চাচ্ছিলাম, কি করে এর থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করতে চাচ্ছিলাম। সে সময় জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করার কোন সুযোগ এখানে ছিল না, প্রায় দু দশক ধরে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রভাবিত করার কঠিন প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি এ সুযোগ তৈরী করেন। আমরা ভালো পরিবেশ ও কাজ করার সুযোগ চাচ্ছিলাম। তারাও অনুধাবন করলেন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা চিকিৎসা জার্নালগুলো আমাদের লেখা প্রকাশ করছে। আমার মনে হয় অবশেষে নীতি নির্ধারকরা উন্নত গবেষনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তিউনিসিয়ার জেনেটিক্স-চিকিৎসক গোষ্ঠীতে ১০০ জনের মতো চিকিৎসক ও প্রযুক্তিবিদ আছেন যারা সমস্ত আরব দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশী গবেষণাপত্র প্রকাশ করে থাকেন। হাস্যোজ্জল মুখে চৌবানি

বলছিলেন, 'আমাদেরকে PubMed -এ স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং আমরা মিশর থেকে এগিয়ে আছি। পরিমান দিয়ে নয় কারণ মনে রাখবেন আমরা তুলনায় আকারে তাদের মাত্র এক দশমাংশ।'

গত তিরিশ বছর ধরে চৌবানি দেখছেন, একসময় যারা তার কথার প্রতিবাদ করতেন এখন তারা কিভাবে তার কথার অনুসারী হতে শুরু করেছেন। একটা সময়ে প্রজনন এর উপর কোন উপদেশ নেয়া কিংবা এ সমন্ধে কোন চিকিৎসা নিতে আসাকে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ গন্য করা হতো। কিন্তু এটা এখন সামাজিকভাবে অনেক বেশী গ্রহন যোগ্য এবং যে সমস্ত বিষয়গুলোকে আগে একদম সাদা চোখে অবহেলা করা হতো বা কখনও কোন গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হতো না, যেমন অটিজম আক্রান্ত শিশু, যেটা অনেকের মধ্যেই চিহ্নিত করা যায়, এগুলো নিয়ে এখন প্রায়ই খোলামেলা আলোচনা হচ্ছে।

এগুলো নিয়ে চৌবানি এখনও প্রায়ই লক্ষ্য করেন কিভাবে তার উপদেশ রোগীদের চিরন্তন বিশ্বাসের অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। অন্যান্য আরব ও মুসলমান দেশের মতো, তিউনিসিয়াতেও জন্মগত ব্যাধির প্রকোপ অনেক বেশী, তারমধ্যে বৃক্কীয় ও রক্ত সমন্ধীয় জটিলতাও অন্তর্ভুক্ত, এর কারণ হিসেবে নিকট-আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিবাহকে তিনি আবিস্কার করেন।

এখানে এবং আরব বিশ্বের সমস্ত জায়গায়, রক্ত সর্ম্পকের ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে এমনকি আপন চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যেও বিয়ে করা এটি একটি সাধারণ প্রথা । তিনি বলছিলেন যদিও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছেএটি এখন কমছে। এটার মানে, ইতোমধ্যেই তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের একই রকম অসংখ্য জীনের অংশীদার।

অন্যন্যক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ গবেষণাকে পরিপূর্ণ সহায়তা দেয়া হয় না। প্রজনন চিকিৎসা শাস্ত্রে এমনকি ব্যবহারিকভাবে প্রযোজ্য জ্ঞানও ইসলামিক প্রথার সাথে বির্তকের জালে জড়িয়ে যেতে পারে। চৌবানি বলছিলেন, অস্বাভাবিকতা পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা কোন কঠিন কাজ নয়, সেটা শুধুই অনুসন্ধান। কিন্তু যখন পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ক্লিনিকে রোগীদেরকে প্রজনন সমন্ধে উপদেশ দিতে যাই সেখানেই সমস্যার শুরু হয়। সেখানে এমন লোকও থাকে যারা বাচ্চা নেয়া বন্ধ করা কিংবা কাছের স্বজনদের মধ্যে বিয়ে না করার উপদেশ মেনে নিতে পারে না।

আজকাল জন্মপূর্ব পরিস্থিতি যাচাই এবং প্রজনন পরীক্ষা অনেক বিশদভাবে সমাজে গ্রহণযোগ্যে এবং আজকাল মায়েদের জীবন রক্ষার্থে ডাক্তাররা গর্ভনাশের ব্যবস্থা করে দেন। ইসলামিক আইন চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে ১২০ দিন পর্যন্ত ভ্রুনের গর্ভ নষ্ট করার অনুমতি দেয় (যেখানে মায়ের জীবন ঝুকির সম্মুখীন); বলা হয় হয় সে সময়কাল পর্যন্ত ভ্রুনের আত্মা থাকে না, নইলে সে গর্ভ নষ্ট নরহত্যার সমান

অপরাধ। চৌবানির জন্য প্রধান সমস্যা হলো মত পরিবর্তন করানো। তিনি বললেন, 'তারা যুক্তি খুজতে থাকে কিভাবে আমাকে ভুল প্রমানিত করা যায়'। তারা অন্য ডাক্তারের কাছে যায়। অবশেষে তারা গতানুগতিকভাবে আমাদের উপদেশই মানেন, কিন্তু এটা অনেক কঠিন কারণ আমি তাদেরকে খারাপ সংবাদ দিচ্ছি যেটা তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসের বিপক্ষে যেতে পারে।

মোহাম্মেদ হাদ্দাদ, তিউনিসের ডি লা মানোওবা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ, অনেক ছোট ছোট আকস্মিক আঘাতের কথা উল্লেখ করলেন যেগুলো সাধারণ মানুষের মনকে বৈজ্ঞানিক সুবিধার প্রতি বিমুখ করে তুলতে পারে। উদাহরনস্বরূপ, সম্প্রতি একজন শেখ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি কোরানের আলোকে এইডস এর ঔষধ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি ইয়েমেনের বাসিন্দা কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তিনি আমাদের নসিহত করেন, এবং এগুলো এখন বড় ব্যবসা। হাদ্দাস বলছিলেন, সমস্যা হল, সাধারণ লোক তাদের কথা শুনছে। এ সমস্ত ব্যায়ারপ স্যাপার চলতে দিলে অনেক লোক মারা যাবেন।

আম্মান, জর্দান ঃ কোরানে বলা আছে 'পড়ো' কিন্তু কোথাও এটা বলা হয়নি যে কোরানকে পড়ো। ১৯৭০ সালে জর্দানের সবচেয়ে বড়ো গবেষনা কেন্দ্র 'দি রয়্যাল সায়ন্টিফিক সোসাইটির' একজন প্রতিষ্ঠাতা জনাব প্রিন্স আল হাসান বিন তালাল বলছিলেন, বলা আছে শুধু পড়ো। হাসান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন যতদিন না তার ভাই রাজা হুসেন তাকে উপেক্ষা করে নিজের ছেলে আবদুল্লাহকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। ষার্টোধ্ব যুবরাজ যিনি উচ্চমানসম্পন্ন আরবী ও অক্সফোর্ড ইংরেজীতে কথা বলেন এবং বাইবেলের হিব্রু পড়েছেন তিনি জর্দানে যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে তার একটি পুর্ন তালিকা দিতে পারেন। পশ্চিমা সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো থেকে যে সমস্ত সাহায্যের প্রস্তাব আসে, সে সমস্ত সমস্যার কারণগুলোকে চিহ্নিত পর্যন্ত করা হয় না বরং সেগুলোকে ঠিকমতো না পড়াই একটি প্রথা হয়ে দাড়িয়েছে। তিনি নিজে খুবই পড়ুয়া একজন, আমাদের চল্লিশ মিনিটের উপরের সাক্ষাতের সময়ের মধ্যেই তিনি কিরকেগার্দ, কারেন আর্মস্টঙ্গের এ হিষ্টোরী ওফ গড এবং ১৯৩৯ সালে তার স্ত্রীর আত্মীয় সাউদ হাসানের লিখিত হোয়াট প্রাইস টলারেনস এর কথা উল্লেখ করেন।

তিনি অকপটে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদেরকে 'সমাজের আবর্জনা' হিসেবে অভিহিত করছিলেন আর প্রশ্ন করছিলেন তাদের বৈধতা সম্পর্কে যারা পৃথিবীকে নবীর সময়ের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। তিনি প্রশ্ন করছিলেন আমরা কি 'ইসলাম' নিয়ে নাকি 'ইসলামিজম' নিয়ে কথা বলছি, তিনি ধর্ম আর নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা চরমপন্থী সুযোগ সন্ধানীদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে কথা বলছিলেন। ইসলামী চরমপন্থীদের দ্বারা যে বিপদের সৃষ্টি তার ভয় শুধু খ্রীষ্টানদের নয়, খোদ মুসলমানদেরই আছে। আরব - ইস্রায়েল সমস্যা আসলে প্রকৃত কারণ নয়, প্রকৃত কারণ হলো উগ্র ইসলামিজমের উথথান।

প্রিন্স হাসান বিশ্বাস করেন, দেশের ভবিষ্যত স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার জন্য ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানকে অনুসরণ করা উচিৎ এবং তিনি ব্যক্তিগত লক্ষ্য হিসবে গত প্রায় চল্লিশ বছরের বেশী সময় ধরে দেশের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। যে সমস্ত প্রকল্পের দ্বারা আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে তিনি সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেন, এরমধ্যে ইস্রায়েলও অর্ন্তভুক্ত, যদিও এই দেশগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পর্ক ততোটা উষ্ণ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্কিত।

তিনি উল্লেখ করলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপের এখন কাজ চলছে। রয়্যাল সায়েন্টিফিক সোসাইটির একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation বা TREC। এটি একটি বহুজাতিক উদ্যোগ - যেটি বাতাস, পানি, ভূ-গর্ভস্থ তাপ ও সৌরশক্তি র মত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওমান থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত বিকল্পশক্তির চাহিদা মেটাবে। এ উদ্যোগ যদি সফল হয়, তাহলে এই প্রচেষ্টার সুফল অনুধাবন করতে দশকের পর দশক কেটে যাবে। যেমন মুসা নেবো পাহাড়ের সামনে দাড়িয়ে ছিলেন (যদিও পৌরনিক কাহিনীতে পাহাড়ের অবস্থান সমন্ধে বলা হয়েছে আস্মান থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বের কথা যাহা ডাহা মিথ্যা) সমগ্রকে দেখবেন বলে, ষাট বছর বয়স্ক যুবরাজ নিজেও জানেন বৈজ্ঞানিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ্ন দেশ দেখে যাওয়া হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

'দৃষ্টিভঙ্গী' তিনি বললেন, 'এটি কোন পৃথক বিষয় নয়, এটি একটি সামগ্রিক ব্যাপার'।

আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দুর্দৈব হলো, মেধার ঘাটতি, তিনি স্বীকার করলেন। সমস্ত আরবের সব শিক্ষিত মেধাবীরা মহামারীর মতো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন জীবন যাপনের জন্য, আর যে সব ছাত্ররা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে যান, তাদের অর্ধেকের বেশী কখনও দেশে ফেরেন না। হাসান বললেন, এ্যামেরিকার নাসার অর্ধেকেরও বেশী কর্মজীবি মধ্যপ্রাচ্যের বাসিন্দা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে জর্দানে মিশরের তুলনায় মেধার অভাব অনেক বেশী দৃষ্টিগোচর হয় কারণ এখানে সম্পদের পরিমান একদম নিম্ন সীমানায় চলে এসেছে। ইসলামী উগ্রপন্থীরা প্রায় ৭০০,০০০ এর ও বেশী ইরাকী উদ্বাস্তুদেরকে জর্দানে আশ্রয় দিয়েছে। ছয় মিলিয়ন লোকের দেশ জর্দানের জন্য এটি খুব বড় একটি বোঝা। এই সংখ্যার ভয়াবহতা তখনই উপলব্ধি করা যাবে, যখন কেউ কল্পনা করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চার বছরের মতো সময় নিয়ে সেখানে মাত্র ৩৫ মিলিয়ন লোককে ঢুকতে দেয়।

জনসংখ্যার আধিক্য সেখানে মুদ্রাস্ফীতি তৈরী করেছে, ভাড়া এবং সম্পত্তির মূল্য এখন সেখানে আকাশ ছোয়া, আর গ্রামগুলো অগোছালো। মিশর, তিউনিয়া এবং সিরিয়ার মতো (এ ব্যাপারে ইস্রায়েলের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে) জর্দানের কোন উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, শুধুমাত্র কিছুটা তেল আর পরিস্কার পানি ছাড়া। বাস্তবে, জর্দানের বেশীর ভাগ নদীর পানিই অন্য নদীতে প্রবাহমান, নদীর পানি আর আরব সমুদ্রে যায় না, এমনকি আরব সাগর দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রটিতে নতুন করে প্রাণ আনার অনেক পরিকল্পনাই রয়েছে কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই আঞ্চলিক সহযোগিতা, যেখানে ইস্রায়েল আর প্যালেষ্টাইনের অংশ গ্রহনের ব্যাপার রয়েছে। সেই সাথে চাই পশ্চিমা সাহায্য।

জর্দানে অর্থনৈতিক সম্পদেরও অভাব রয়েছে, এখানকার পরিস্থিতি তেল সমৃদ্ধ আরব উপকূলের দেশ গুলো থেকে ভিন্ন যেখানে রকমের জ্ঞান - বিজ্ঞান দ্রব্য মুল্যের মত বিকি-কিনি করা যায়, দরকার হলে বাইরে থাকে আমদানী করার সার্মথ্য ও তাদের আছে। তারচেয়েও বড়ো হলো, বিপদের আশঙ্কা, ২০০৫ সালে সন্ত্রাসীরা আম্মানের তিনটি হোটেলে বোমা ফেলেছে, এবং আল কায়েদা একজন এ্যামেরিকান ডিপ্লোম্যাটকে হত্যা করার কথা স্বীকারও করেছে, এ সমস্ত কিছুই জর্দানীয়ান অর্থনীতির উপর মারাত্নক প্রভাব ফেলেছে যার কারণে জর্দানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎস পর্যটন, পর্যটক কমে গিয়ে তাদের রাজস্ব আয় ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

মজার কথা হলো জর্দান, ইরাক এবং আরো একটি কঠিন জায়গার মধ্যে আটকে আছে। তবে এ মূহুর্তে এদেশটি আরবের মানবাধিকার উন্নয়নের অনেক সমস্যা যা আঞ্চলিক বুদ্ধিজীবিদের অসম চিন্তার কারণে ভুক্তভোগী বলে রিপোর্টে দোষারোপ করা হচ্ছে তার একটি মূর্ত প্রতীক। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার অভাব আছে এবং এদের অকেজো, প্রভুত্বপরায়ন সরকার যাদের নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে সীমাহীন ক্ষমতা দেয়া আছে, যদি পদস্থ কাউকে কেউ চেনে সেটা তার মেধাকে অতিক্রম করে পদোন্নতিতে সাহায্য করে, এবং এই অঞ্চলের গবেষকদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীন যোগাযোগ। শিক্ষার সুযোগ এখানে নিতান্তই সীমিত, বিশেষ করে মেয়ে এবং মহিলাদের জন্য। এসব কিছুর মানেই হলো, তুমি যদি একজন মেধাবী বিজ্ঞানী হও, একটা বড় সম্ভাবনা থেকেই যায় যে তুমি একসময় জর্দান ছেড়ে চলে যাবে।

‘বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য চাই স্থিতিশীলতা, গনতন্ত্র আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা ’ বলছিলেন সিনেটর **আদনান বাদরান** যখন আমরা তার অফিসে বসে টার্কিস চা পান করছিলাম, যিনি মিশিগানের ষ্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আনবিক জীব বিজ্ঞানের উপর ডি - লিট অর্জন করেছেন।

‘মুক্তচিন্তা চর্চার জন্য, অনুসন্ধিৎসু হবার জন্য মানুষের একটা উপযুক্ত পরিবেশ চাই। সেটা যদি না থাকে কখনই তুমি মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোকে মুক্ত করার সুযোগ পাবে না। আরব অঞ্চলগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে এটি খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন, নিরাশাময় একটি গল্প’।

তিনি পনেরশ শতাব্দীতে আরম্ভ হওয়া দিশাহীন প্রথাকে এর জন্য দোষারোপ করলেন। আস্তে আস্তে শিক্ষার মান নীচু করে, অন্ধবিশ্বাসের বিস্তার শুরু হলো। আমরা বড় মনের ছিলাম, ইসলামও উদার ছিল, একটি প্রচন্ড বিশ্বাসী সংলাপ। এটি ছিল সহনশীল, অন্য সভ্যতার সাথে সহজেই মিশে যেতে পারতো। এরপরেই আমরা অন্ধবিশ্বাসী হতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, ‘ যখনই তুমি গোড়া, তখনই তুমি একটি গন্ডীতে আবদ্ধ ’। যদি তুমি গন্ডীর বাইরে পা রাখ, তুমি একটি প্রান্তে এসে উপস্থিত হও - এবং তখন তুমি মুক্ত, তুমি তখন সুযোগ পেলে পশ্চিমে চলে যাও।

এবং সেটাই বাদরান করেছেন, বিশ বছর ধরে তিনি ফ্রান্সে আর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, এখানে তিনি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর জন্য গবেষনা করে চারটি পেটেন্ট অর্জন করেছেন। তার কাজ হলো কলার পেকে যাওয়া বন্ধ করা, যার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসামান্য, বিলিয়ন ডলারের সাশ্রয় হয় এর মাধ্যমে, সম্ভাবনা, কারণ এই জন্যই কোম্পানীগুলো পুরো পৃথিবী জুড়ে তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য সরবরাহ করার অনুমতি পায়, পচন ছাড়া।

এরপরও বাদরান জর্দানে তার নিজের ভূমিতে ফিরে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করেন, এমনকি তিনি আম্মানে অবস্থিত ফিলাডেফিয়া ইউনিভার্সিটিতে প্রেসিডন্টসীর মর্যাদাও ভোগ করেন ১৯৮৭ সালে, তিনিই ছিলেন জর্দানের উচ্চতর পরিষদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল, যাকে পরে রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ সিনেটর হিসেবে মনোনীত করেন। তারপর ২০০৫ সালে রাজা তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসবে নিয়োগ করেন, তিনিই ছিলেন প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। রাজা যিনি সান্ধহুর্স্টের রাজকীয় মিলিটারী একাডেমীতে পড়াশোনা করেছেন, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, এবং ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতেও পড়াশোনা করেছিলেন, তিনি বাদরানকে শুধু আরব সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন?

বাদরান বললেন, আমি সমস্ত কায়েমী স্বার্থ বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছিলাম, স্বজনপ্রীতি থেকে পরিত্রান পেতে, আমি জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। বাদরানের সময়ে সেখানকার পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল, যাইহোক, একজন সাংবাদিক আমাকে জানালেন, বাদরান একজন খুবই উচুদরের শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি ব্যর্থ।

৬

২০০৫ সালের নভেম্বরে যখন আত্মঘাতী বোমা হামলা কারীরা আম্মানের তিনটি হোটেলকে তাদের হামলার নিশানা বানালো সেই সাথে **বাদরানের** পরিকল্পনা নিয়ে সামনে অগ্রসর হবার রাস্তাও বন্ধ হয়ে

গেলো। তখন সরকারের সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ল দেশের আভ্যন্তরীন উন্নতিকে ছেড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাদরানেরও পরিবর্তন হলো। এখানে প্রধানমন্ত্রীকে রাজার পছন্দমতো কাজ করতে হয় এবং অনেকেই বলেন, এতে জর্দানের নিরাপত্তা বাহিনীর মৌন সম্মতিও লাগে। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাদরানকে চাকুরী থেকে বাদ দিয়ে তার পুরনো জায়গায় সিনাটেতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হলো (তার চিন্তাভাবনা সে সময় অতিমাত্রায় 'আদর্শবাদী' হিসেবে দেখা হয়েছিল)।

বাদরানের পরে আমি জর্দানের সবচেয়ে বেশী প্রাণবন্ত এবং আশাবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তার ব্যক্তিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। আম্মানের ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে, নোংরা ও অপ্রশস্থ একটি ঘরে পদার্থবিদ **হামেদ তারাউনেহ** এর সাময়িক কর্মস্থল, সেখানে দাড়িয়ে আমি সাথে তার কথা বলছিলাম। নিরবিচ্ছিন ধূমপায়ী লম্বা - চওড়া কাধের সৌম্য দর্শনের তারাউনেহর ঠোঁটে সব সময় একটি

আন্তরিকতার হাসি ঝুলে থাকে, বহু বছর আগে তিনি তার পিএইচডি এর জন্য সুইডেনে এ পাড়ি দেন, আমাদের এই সাক্ষাতের কিছু দিন আগেই মাত্র তিনি জর্দানে পদার্পন করেছেন। তিনি SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) এর জন্য প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদদের সমন্বিত করার একটি প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। এটি একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন গবেষনাগার যেখানে পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ঔষধ এবং প্রত্নতত্ত্ব সমন্ধে গবেষণা করার অনেক সুযোগ ও যন্ত্রপাতি আছে। মুসলিম বিশ্বে এই প্রথম এমন বহুমুখী সুযোগ সম্পন্ন গবেষনাগার তৈরী হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করার জন্য।

জর্ডানের SESAME ফ্যাকালটি

রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ SESAME এর জন্য জমি এবং প্রতিষ্ঠানটি চলার জন্য প্রায় দশ মিলিয়ন ডলারের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করাতে জর্দানকেই SESAME এর মনোনীত করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের চিরাচরিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রথা পুনরুদ্ধারের জন্য তৈরী করা সুইটজারল্যান্ড এর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পর্দাথ বিজ্ঞানের গবেষণাগার CERN এর আদলে বানানো। আশা করা যায় ২০০৯ সালে যখন SESAME পুরোপুরি চালু হবে, এই বছরের জুনের মধ্যে আম্মানের নিকটে আল-বালকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সব সুযোগও চলে আসবে, গবেষকরা ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ করবেন পুরো সপ্তাহ জুড়ে - লম্বা অধিবেশনে। ইউরোপীয়ান আদলের মতো SESAME এর একটা অংশও আশে পাশের সব উজ্জল প্রতিভাবানদেরকে নিয়ে কাজ করতে চায়, নইলে যারা বিদেশ থেকে দেশে ফিরবে তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ও আর্কষনীয় সুযোগ সৃষ্টি করবে যা পরবর্তী তরুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহী ও আগ্রহী করে তুলবে।

তারাউনেহ আশা করছেন অচীরেই SESAME জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হবে বিশেষ করে সেসব সদস্যদের জন্য যারা বাৎসরিক ব্যয় ভার বহন করছেন, একটি দল যার মধ্যে আছে বাহরাইন, মিশর, পাকিস্তান, তূর্কী ও প্যালেষ্টাইন এর সরকার জড়িত আছে, এবং ইস্রায়েল, যেটি একমাত্র দেশ যাদের একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ রয়েছে, তথাপি তারা তথাপি তারা আমাদের থেকে জনবিচ্ছিন্ন। তারাউনেহ বললেন, 'আমরা বিজ্ঞানী'। 'আমরা রাজনীতির তোয়াক্কা করি না, আমাদের এখন সুযোগ হয়েছে জ্ঞান - বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার এবং সবার মঙ্গলের স্বার্থে জ্ঞানের আলো জ্বালার। আরম্ভটা খুবই চমৎকার। এটি একটি বহুজাতিক পরিবেশ, যেটার প্রচন্ড অভাব ছিল আমাদের। এখন আমরা একে অপরকে বিজ্ঞানী হিসবে, মানুষ হিসেবে জানতে পারব।

আমি তাদের নিয়েও চিন্তা করি- সেই সব মহাবিজ্ঞানীরা যারা জর্দান পরিত্যাগ করে চলে গেছেন কিংবা জর্দানকে সম্ভাবনাহীন বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের সম্পর্কে।

'আমি যদি বার্কেলে চলে যাই তাহলে কি আমি বেশী আয় করব'? তারাউনেহ জিজ্ঞেস করলেন? হ্যা, অবশ্যই, কিন্তু আমি এ জায়গার। আমি আরবের, আমি মুসলমান। এখানেই আমি থাকতে চাই। আর কেনই আমরা নিজেরা আমাদের নিজস্ব কিছু তৈরী করতে পারব না? আগামী পাচ বছরে অন্যরা দেখবে এটা কতো ফলপ্রসু হয়েছে। এবং এটা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের কৌতুহল মেটানোর জায়াগা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি তৈরীর সেতু হিসেবে কাজ করবে। বিজ্ঞানের পথেই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব। এটি পৃথিবীর মানুষের উন্নতি এবং অগ্রগতির সোপান।

তারাউনেহ এর আগ্রহ এবং উৎসাহের জন্য SESAME এর সাফল্য অনিবার্য। কিন্তু রাজার সাহায্য আর প্রকল্পটির আর্ন্তজাতিক চরিত্র এটিকে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির সাফল্য থেকে অনেক বড় করে তুলেছে।

এটি ঠিক সেই ধরনের একটি আঞ্চলিক প্রকল্প যেটিকে সেই এলাকার লোকজন বিশেষ পছন্দ করে, যুবরাজ হাসান বলছিলেন আরব বিশ্বের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য এটিই আসল রোড ম্যাপ। যন্ত্র এবং কল্পনার একটি সংমিশ্রন যেহেতু, দ্রুত ও জোর গতিতে বৈজ্ঞানিক জগতের দিকে রশ্মি ফেলছে, হয়তো এটি সবার প্রার্নারই ফসল।

টড পিকক, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, লেখক এবং ফটোগ্রাফার। তার 'বিজ্ঞান ও ইসলাম : অন্তিম সংঘাত' - প্রবন্ধটি ২০০৭ সালের জুন মাসে ডিস্কভার ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয়।

তানবীরা তালুকদার, লেখক এবং নৃত্যশিল্পী। নেদারল্যান্ডস-এ বসবাসরত মুক্তমনার কো মডারেটর। অনেকদিন ধরেই ইন্টারনেট-এ লিখছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ দেশের দৈনিক পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। ইমেইল - tanbira.talukder@gmail.com